রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চেতনাঃ এক অনন্ত পথ চলা

দীপক সেন গুপ্ত

০৯ মে ২০২১

অতিমারী করোনার দাপটে মৃত্যুর মহোৎসবে দাঁড়িয়ে এবছরের ২৫শে বৈশাখ উচ্ছল জীবনের আনন্দের উদযাপনে নয় মৃত্যুকে উপলব্দি করার যন্ত্রণা অনুভব করছি। যন্ত্রণা উপশমে কবিগুরুকে স্মরণ করি। মৃত্যু বিলাসিতায় নয় মৃত্যু চেতনায় রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে বেড়াই জন্মদিনের উৎসবে।

প্রাত্যহিক যাপনে যে বা যারা প্রলম্বিত ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামক মহীরুহের প্রচ্ছায় ক্লান্ত জীবনের প্রশান্তিকে সন্ধান করেন ৩৬৪ দিনের পথ পরিক্রমা শেষে এই দিনটিতে অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ এসে নূতন করে হৃদয়ে কবিকে খুঁজে পেতে কবির সামনে নতজানু হয়ে বসি। মৃত্যুর অন্ধকার কাটিয়ে প্রভাত সঙ্গীতের আলোয় যার যাত্রা শুরু হল সেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের যাত্রা পথে বারবার মৃত্যু এসেছে কবি কিন্তু হার মানেননি সৃষ্টির আনন্দে তিনি পথ হেঁটেছেন আমৃত্যু। তিনি যখন জীবনের উজ্বল আলোয় পথ হেঁটেছেন, মৃত্যু এগিয়েছে জীবনের প্রলম্বিত ছায়ায়। প্রভাতী মিছিলের সমবেত সঙ্গীতে নয়, করোনার ভয়ে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের বিমর্ষতায় কবিগুরুর জন্মদিন উদযাপনে মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়ায়। আপনজনহারানোর দুঃখবোধ, মৃত্যুর শীতল স্পর্শ এবং চিতার দহন যন্ত্রনা উপশমে কবির সামনে দাড়িয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চেতনাঃ একঅনন্ত পথ চলা

Ishan Kotha

বৌঠান কাদম্বরীর মৃত্যুর বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে "প্রভাত সঙ্গীতের" আলোয় নিজেকে খুঁজে পাওয়া এবং নিজের ভিতরের কথা, গান এবং প্রাণের আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল কবির নূতন যাত্রাপথে মৃত্যু বারবার এসেছে এবং প্রত্যেকবার মৃত্যুকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করেছেন দহনের অভিজ্ঞতায়। "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। ..... এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে ----- আমার এই দেহখানি তুলে ধর / তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো"। এমনতর মৃত্যু চেতনায় নশ্বর দেহের আলোয় প্রকৃতি যতটা আলোকিত হয় অন্তরাত্মাও ততটাই উদ্ভাসিত হয়। একরবীন্দ্রনাথের ভিতরে অনেক রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন, একরবীন্দ্রনাথ বলেছেন " মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" অন্য একরবীন্দ্রনাথ বলছেন " মরণ রে তুহুঁ মম শ্যামসমান"। এই দুই রবীন্দ্রনাথের দ্বিরালাপের মধ্যেই তৃতীয় রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ এবং প্রতিস্পর্ধী হুঙ্কার "তুমি যত বড় হও না কেন / তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও / আমি মৃত্যুর চেয়েও বড়"। মৃত্যু চেতনা আরমৃত্যু বিলাসিতা এককথা নয়। মৃত্যু বিলাসিতা মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায় যেমন দেখি জীবনানন্দ দাশের "আট বছর আগের একদিন" কবিতায় যেখানে স্ত্রী কিংবা সন্তানের বাহুপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুর সঙ্গে অভিসারে বেরিয়ে যায় রাতের গহন অন্ধকারে এবং অশ্বত্থ গাছে বসে মৃত্যুক চুম্বন করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চেতনা "দুর্লভ জন্ম" কবিতার জন্ম দেয় যেখানে কবি তুচ্ছ বলে যাকে হেয় করেছেন সেই তুচ্ছাতিচ্ছুকেও বরণ করতে ইচ্ছুক। রসসিক্ত জীবনের স্বাদ আস্বাদনে ব্যস্ত কবি মৃত্যুকে উপেক্ষা করেননি কিন্তু মৃত্যুর কাছে ভয়ে ভীত হয়ে নতজানু হয়ে কোন ভিক্ষা চাইতে দেখিনি। ভয়ভীতি রবীন্দ্র মানসে নেই তিনি সোচ্চারে বলেছেন "অচেনা রে ভয় কি আমার ওরে --- অন্য এক কবিতায় বলছেন "বিপদে যেন না করি ভয়"। একই টাইম ফ্রেমে দাঁড়িয়ে অতুলপ্রসাদ যখন বিলাপ করছেন "এতহাসি আছে জগতে তোমার / বঞ্চিলে শুধু মোরে" তখন রবীন্দ্রনাথ বলছেন "চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি.....আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"। কোন সংকোচিত মন নিয়ে নয় প্রসারিত হৃদয়ে আনন্দে অবগাহন করতে হয়। অতুলপ্রসাদ বা জীবনান্দ দাশরা মৃত্যুর খোলা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সুসজ্জিত জীবনের আলোকিত ঘরকে দেখেছেন অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ সুসজ্জিত জীবনের আলো ঝলমলে ঘরে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে দেখেছেন। কখনোবা খিড়কির ভিতর থেকে প্রসারিত হাতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের মৃত্যুর শীতলতাকে ছুঁয়ে দেখেছেন তারপর হাত গুটিয়ে নিয়েছেন আরগেয়েছেন "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে / তবুও শান্তি, তবুও আনন্দ জাগে .....নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে"। মৃত্যুকে নিয়ে বিলাসিতা করার বিন্দুমাত্র অবকাশ তাঁর ছিল না কেননা এত এতপ্রাণাধিক প্রিয় মানুষের মৃত্যুর দহন যন্ত্রনায় দগ্ধ হতে হয়েছে তাঁকে । শৈশবেই মাতৃহারা, মায়ের আবছা স্মৃতি মাত্র পরিণত জীবনে কবির অনেক লেখায় ও কবিতায় ফুটে উঠেছে যেমন "মাকে আমার পড়ে না মনে / শুধু কখন খেলতে গিয়ে / হঠাৎ অকারণে.....। মৃত্যু বোধ জন্মানোর বয়স হয়নি তখন, কিন্তু মায়ের অনুপস্থিতিতে সৃষ্ট শিশু মনের শূন্যতার ভিতর থেকে গুঞ্জরনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে বেহাগ সুর বাজত পরবর্তী জীবনে। তারপরেই এল বৌঠানের মৃত্যু যে মৃত্যুর ভিতর থেকেই কবি নূতন ভাবে জেগে উঠলেন। কথা ও সুরের পথ ধরেই চলল অন্তহীন বৌঠান অন্বেষণ। "আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব / সারা রাত ফুটুক তারা নব নব" সেই তারার আলোতেই খুঁজেছেন বৌঠানকে। খণ্ডিত বৌঠানকে অনেকের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন হয়তো কিন্তু সমগ্রকে নয়। সমগ্র বৌঠান অবচেতনের গাঢ়তর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা একপ্রদীপ। অবচেতন মনে জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি অবস্থান, কবিকে সেই পূর্ণাতার সন্ধান দিয়েছে যেখানে পৌঁছে কবি বলতে পারেন

“তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই – কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই”। বৌঠানের পরেই স্ত্রী মৃণালিনী এবং তারপরেই কন্যা রেণুকার মৃত্যু এবং পরে পুত্র শমীর মৃত্যু কবিকে মৃত্যু নামক ভয়াবহ দানবের সামনে দাঁড় করিয়েছে কিন্তু কবি বারে বারে বেরিয়ে এসেছেন। বেরিয়ে এসেছেন অন্ধকার মৃত্যুর চক্রব্যূহ থেকে জীবনের আলোতে।

যৌথ পরিবারে আরওকতমৃত্যু এসেছে , কবি তো যন্ত্র মানব নন তাঁর মন ছিল।

একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয় , কবির যুবক বন্ধু সুকুমার রায়ের মৃত্যু শয্যায় কবি বসে আছেন। সুকুমার রায়ের অনুরোধে গেয়ে শোনালেন দুইটি গান প্রথম গানটি আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে' অন্য গানটি হচ্ছে ' দুঃখ এ নয় সুখ নহে গো.....'। দ্বিতীয় গানটি কবি আবার গাইলেন সুকুমার রায়ের চোখে জল। পরে কবি বলেছিলেন মানুষ জন্মায় মৃত্যুকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার পাথেয় নিয়ে। সুকুমার রায়ের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি বলেছেন মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীমের জয়গান তিনি গাইলেন'। কবির সংবেদনশীল মন বিষাদগ্রস্ত হয়েছে তবে বিষাদ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন সাধারণ মানুষের মত বিষাদের গোলকধাঁধায় পথ হারাননি। জীবনস্মৃতি বইয়ের “ মৃত্যুশোক” কবি বিলাপে আত্মভোলা হননি অত্যন্ত সংযত ও পরিমিত ভাষায় লিখলেন “শূন্যতাকে মানুষ কোনমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারেনা। যাহা নাই, তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই”। কি আশ্চর্য একের মধ্যে বহু আর বহুর মধ্যে একের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি কিন্তু দর্শনের সুর এক্য কোন বিভ্রান্তি নেই। এই শোকালাপেই ধ্বনিত হল সেই দর্শন যে দর্শন কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলতে “আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ” । কোন শোকের অভিব্যক্তি বা কবিতার একটি লাইন মাত্র নয় একটি দর্শন যে দর্শনে ছিল অটল বিশ্বাস যে বিশ্বাসে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছেন। পুত্র শমীর মৃত্যুর পর তিনি প্ল্যানচ্যাট করতেন, শমীর মৃত্যুর পর যে গান লিখেছিলেন তাতে একটা বাক্য ছিল “আমারে যে জাগতে হবে কে জানি সে আসবে কবে”। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কবির অবিস্মরণীয় উক্তি “ .....শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাতে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি, সমস্তর মধ্যে সব রয়ে গেছে। আমিও তার মধ্যে”। তিনি বলেছিলেন “কে বলেগো সেই প্রভাতে নেই আমি, সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি / আহা নতুন নামে ডাকবে মোরে বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে / আসবযাব চিরদিনের সেই আমি” । কবির এই “আমি” নৈর্ব্যক্তিক, চিরন্তন। কবির এই “আমি” দেহ নিরপেক্ষ চেতনা সমৃদ্ধ একনৈর্ব্যক্তিক সত্তা। অন্য এককবি যেমন বলেছেন “মানুষের মৃত্যু হলেও মানব থেকে যায়” এটা যেন রবীন্দ্রচেতনার প্রতিধ্বনি। তিনি ভাববাদী ছিলেন এবং আধিভৌতিক সত্তায় বিশ্বাসী যেমন ছিলেন তেমন জন্মান্তরবাদে ছিল বিশ্বাস।নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের ‘মৃত্যু’ কবিতার শেষ দুইটি লাইন “স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে মূহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে “।রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়ে শবদেহকে নিয়ে যে মিছিল হয় তাতে একটা বিশেষ গানকে গুরুত্ব দিয়ে গাওয়া হয় সেটা হচ্ছে “সমুখে শান্তি পারাবার, ভাসাও তরণি হে কর্ণধার”। তিনি বিশ্বাস করতেন **DEATH IS EXTENSION OF LIFE** শুধু তাই নয় তিনি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন “অশ্রুনদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে”